শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা

বাংলাদেশে সুশীল সমাজের বিবর্তন ও কতিপয় বিতর্ক

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

১১ আগস্ট ২০১৪

আয়োজনে
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে সুশীল সমাজের বিবর্তন ও কতিপয় বিতর্ক

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা

ঢাকা, ১১ আগস্ট ২০১৪

মাননীয় সভাপতি ও ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান, শ্রদ্ধেয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন, শিক্ষকবৃন্দ, অতিথিগণ ও প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। সকল শহীদের আত্মত্যাগ আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি। আমার আজকের বক্তব্যের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "বাংলাদেশে সুশীল সমাজের বিবর্তন ও কতিপয় বিতর্ক"। শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতার জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

বাংলাপিডিয়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মোট ১,১১১ শহীদ বুদ্ধিজীবীর হিসাব আছে। এঁদের মধ্যে – ৯৯১ জন শিক্ষক, চিকিৎসক: ৪৯ জন, আইনজীবী: ৪২ জন, সাংবাদিক: ১৩ জন এবং অন্যান্য (সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রকৌশলী): ১৬ জন। অপরদিকে "জেনোসাইড বাংলাদেশ"-এর উৎস থেকে জানতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষকের সংখ্যা ১৯ জন। এছাড়াও ছাত্র ১০১ জন, কর্মকর্তা ১ জন ও ২৯ জন কর্মচারী ১৯৭১ সালে শহীদ হন। প্রয়াত শিক্ষকদের কয়েকজনকে যেমন অধ্যাপক জি সি দেব ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস ধরে বুদ্ধিজীবীদের নিধন করা হয়। এমনকি মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শাম্‌স্‌ বাহিনী বাঙ্গালী জাতির বরেণ্য সন্তানদের বাড়ি থেকে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম-নিষ্ঠুর নির্যাতন করে, ঘটায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশীয় অনুচররা স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবীদের বাছাই করে আঘাত হানে। মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী এই সব বুদ্ধিজীবীগণই ছিলেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের শিরোমণি।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে, ১৯৫৪-র নির্বাচন, ১৯৫৮-র পর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা ও ১১ দফার জন্য সংগ্রাম এবং ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান – বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধিকার ও পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক বুদ্ধিজীবী চিন্তা-ভাবনা-বিশ্লেষণ দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনকে পুষ্ট করেছেন। বিভিন্নভাবে

মানুষকে সংগঠিত করেছেন, স্বীকার করেছেন নির্যাতন, হয়েছেন বৈষম্যের মুখোমুখি এবং এমনকি জীবনও দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ অধ্যাপক শামসুজ্জোহার কথা আমাদের সকলের স্মরণ আছে। এঁরা হলেন বর্তমান বাংলাদেশের সুশীল সমাজের গৌরবোজ্জল পূর্বসূরী। আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সুযোগ নিয়ে তাঁদের সকলের প্রতি জানাই সকৃতজ্ঞ প্রণতি।

শব্দ বিভ্রাট

প্রথমেই স্বীকার করতে হবে 'সুশীল সমাজ' শব্দযুথ, 'civil society' নামক প্রত্যয়টির যুৎসই অনুবাদ নয়। 'civil society'-র বঙ্গমাত্রিক ধারণাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে এ রকম বাংলা শব্দ খোঁজার প্রচেষ্টা কম হয়নি। আমার মনে আছে আশির দশকের দ্বিতীয়ভাগে non-government organisation (NGO) শব্দটি বাংলা করতে বহু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়েছিল। NGO-র বাংলা এখন ব্যবহৃত হয় বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান – অর্থাৎ আক্ষরিক অনুবাদ কাজে দেয়নি। আর অতি সম্প্রতি আমরা আদিবাসী শব্দটি নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে লিপ্ত। আসলে শব্দ তো শব্দ নয়, এর পিছনে থাকে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চিন্তা বা দুশ্চিন্তা। সেই জন্য সঠিক শব্দ চয়ন গুরুত্বপূর্ণ।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) যখন ২০০৬ সালের মার্চ মাসে "জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ" শীর্ষক কর্মসূচিটি শুরু করে এবং নাগরিক কমিটি ২০০৬-এর নেতৃত্বে "রূপকল্প ২০২১" প্রস্তুত করে তখন দুইটি প্রত্যয়ের সঠিক বাংলা নির্ণয়ের চেষ্টা হয়। একটি ছিল ইংরেজি 'Vision' শব্দটির সঠিক বাংলা কী হবে। ২০০৬ সালে এপ্রিল মাসে নাগরিক কমিটি ২০০৬-এর প্রথম বৈঠকের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নেই Vision-এর বাংলা হবে রূপকল্প। পরবর্তীতে ২রা মে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদে পৌঁছাতে আমাদের সাহায্য করেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। সুখের বিষয়, পরবর্তীতে এই শব্দটি জাতীয় পর্যায়ে বহুল প্রচলন পায়; ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারেরও নাম দেয় "রূপকল্প ২০২১"। প্রাসঙ্গিক মনে করে রূপকল্প শব্দটি ব্যবহারের উৎসটি উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেছি।

কিন্তু 'civil society'-র বাংলা নিয়ে কোনো ভালো নিষ্পত্তি করা যায়নি। অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাইয়ীদ প্রস্তাব করেছিলেন – 'জনসমাজ' বা 'আত্মজ সমাজ'। কেউ কেউ 'সুধী সমাজ' বা 'পুর সমাজ' পছন্দ করলেন। তবে অনেকেই 'নাগরিক সমাজ'-এর পক্ষে মত দিলেন। সেটাই

আমরা তখন আমাদের উদ্যোগের জন্য গ্রহণ করি, তবে 'নাগরিক' শব্দটিকে নগরবাসীর সাথে সমার্থক করে দেখে অনেকেই আবার একমত হলেন না। তাই লক্ষ করবেন সিপিডি-র ২০০৬ সালের নামকরণে একই সাথে 'সুশীল সমাজ' ও 'নাগরিক কমিটি' স্থান পেয়েছে। পরে অবশ্য বিভিন্ন কারণে 'সুশীল সমাজ' শব্দযুথ প্রচলন পায়। যথাযথ বাংলা শব্দের অভাবে, আমি সুশীল সমাজ শব্দযুগলের অসম্পূর্ণতাকে স্বীকার করে নিয়েই তা বক্তৃতার শিরোনামে স্থান দিয়েছি।

স্মরণ আছে সে সময় এক বড় রাজনীতিবিদ, যিনি এখন যুদ্ধাপরাধে বিচারাধীন, আমাকে শ্লেষ করে বলেছিলেন, সুশীল মানে তো নাপিত – তোমরা সবাই নাপিত। আমি সহাস্যে উত্তর দিয়েছিলাম – নাপিতের আরেক নাম নরসুন্দর, সুশীল সমাজ মানুষকে সুন্দর করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

সঠিক বাংলা শব্দ চয়নের সমস্যাই বলে দেয়, 'সুশীল সমাজ' প্রত্যয়টি কতখানি জটিল। তাই এর কোনো একক ও অনন্য সংজ্ঞা আছে বলে মনে করি না। আর্থ-সামাজিক বিবর্তন, পরিবর্তনশীল রাষ্ট্র কাঠামো, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে সুশীল সমাজের একটি বর্গীয় সংজ্ঞা (generic definition) নিরূপণ করা গেলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রেক্ষিত নির্দিষ্ট (context specific)। সে অর্থে এটি এখনও একটি বিকাশমান প্রত্যয় (evolving concept), যা অনেকাংশে জাতীয় পরিস্থিতি দ্বারা নির্ণায়িত হয়।

তাত্ত্বিক বিবেচনা

সুশীল সমাজের সংজ্ঞা সন্ধানের ক্ষেত্রে প্রায়শই আমরা খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টোটলের লেখাকে উৎসবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করি। সেই ধ্রুপদী যুগের অন্যান্য যারা ব্যক্তিসত্ত্বার মুক্তি ও একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে আরো চিন্তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সক্রেটিস, প্লেটো ও সিসেরো। সে সময় সুশীল সমাজ, রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজের সমার্থক ছিল – যা বর্তমানে প্রচলিত ধারণার ঠিক বিপরীত। সে সময় সাম্রাজ্য বিস্তার দ্বারা রাষ্ট্র কাঠামোর বিকাশকে সভ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং সেটিই ছিল সুশীল সমাজের অবস্থানের নির্ণায়ক।

খৃষ্টপরবর্তী দেড় হাজার বছর পরে রেনেসাঁর আলোকে মানবিক মূল্যবোধ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে যুক্তিবাদের যুগে রাষ্ট্র ও সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে সুশীল সমাজের ধারণাটি ইউরোপীয় চিন্তকদের রচনায় বড়ভাবে স্থান করে

নেয়। জন লক, জ্যাঁ জ্যাক রুশো, ইমানুয়েল কান্ট প্রমুখ সমাজবিদ দার্শনিকরা এই চিন্তার নেতৃত্ব দিয়েছেন।

অষ্টাদশ শতকে শিল্প বিপ্লবের আবির্ভাবের সাথে সাথে সুশীল সমাজ নিয়ে ঔৎসুক্য নতুন মাত্রা লাভ করে। স্কটিশ নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অ্যাডাম ফার্গুসন সম্ভবত 'civil society' প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তার মতে, সিভিল সোসাইটির কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে মানবজাতি তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর তুলে ধরতে পারে এবং সম্প্রীতির সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটাতে পারে। তিনি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বাইরে মানুষের একটি সামাজিক অস্তিত্বের কথা বলেন। স্কটিশ নবজাগরণের অপর তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড হিউমের লেখার মধ্যেও ফার্গুসনের মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে। অন্য অনেকের সাথে সাথে অ্যাডাম স্মিথ সমাজকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে বিশ্লেষণ করেন। বেনীয়া পুঁজিবাদের প্রেক্ষিতে তিনি রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের ক্ষমতার পাশাপাশি সমাজের স্বকীয় সত্তাকে গুরুত্ব দেন।

উনিশ শতকে ফরাসী সমাজবিদ অ্যালেক্সিস টকভিলের মতো অনেকেই সুশীল সমাজের সনাতনী ধারণাকে অবলম্বন করেই প্রত্যয়টির নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত করেন। টকভিলের মতবাদের আধুনিক প্রকাশ দেখি আমরা মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট পাটনামের লেখায়। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়া ও শিল্প পুঁজির বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিধিকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। লক্ষণীয়, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগে সুশীল সমাজের ধারণাটি একদিকে যেমন রাষ্ট্রের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিল, অপর দিকে তা উদীয়মান বাজার ব্যবস্থা থেকে তার স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করতে চাচ্ছিল।

সুশীল সমাজের প্রত্যয়গত বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়টি দর্শন শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল জর্জ হেগেলের রচনা দ্বারা সূচিত। হেগেলের চিন্তায় সুশীল সমাজ পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার চলক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তিনি বাজার ব্যবস্থা বিকাশের প্রেক্ষিতে সুশীল সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী, শ্রেণী ও সংগঠনকে বস্তুগত স্বার্থের ধারক হিসেবে মনে করতেন। ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত উদ্যোগকেও এক্ষেত্রে সুশীল সমাজের অংশ মনে করা হতো। পুঁজিবাদের পরিপক্কতা লাভের প্রেক্ষিতে ও হেগেলীয় চিন্তার ওপর ভিত্তি করে মহামতি কার্ল মার্ক্স সুশীল সমাজের ধারণাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজকে প্রতিস্থাপন না করে তিনি এই দুটিকে পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী সহযোগী হিসেবে দেখেছেন। তাই তিনি প্রাক্কলন করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণী, আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বহারার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, জিম্মি রাষ্ট্রকে মুক্ত

করবে। সেক্ষেত্রে সুশীল সমাজও সর্বহারার নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রে যুক্ত হয়ে প্রকৃত জনমঙ্গলে নিবিষ্ট হবে।

সুশীল সমাজ সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক চিন্তার আধুনিক পর্যায়ে, হেগেলীয় ও মার্ক্সীয় চিন্তার সংশ্লেষণ ঘটে অকাল প্রয়াত ইতালীর সুবিখ্যাত চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামসীর লেখনীতে। গ্রামসী আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'রাজনৈতিক সমাজ' ও 'সুশীল/নাগরিক সমাজ' এই দুটি প্রত্যয়ের অবতারণা করেন। এখানে প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রায়শই নিবর্তনমূলকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে (ব্যাপক অর্থে) ব্যবহার করে তার আধিপত্য (hegemony) বিস্তার করে। অপর দিকে, সুশীল সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত ও সেচ্ছামূলকভাবে সংগঠিত হয়ে তার অধিকারের জায়গাটুকু রক্ষা করার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রসম্পর্কিত ও রাষ্ট্র-বহির্ভূত (non-state) কর্মের কর্তারা একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে বাজার, পরিবার ও সমাজের চৌহদ্দি নিরন্তরভাবে নির্ধারণ করতে থাকে। গ্রামসী অবশ্য নিজেই বলেছেন, দুই সমাজের এই বিভাজন নিতান্তই একটি বিশ্লেষণী কাঠামো কারণ বহু ক্ষেত্রেই এরা আংশিকভাবে হলেও একে অপরের অপ্রকৃত (virtual) বেষ্টনীতে ক্রিয়াশীল হয়।

সুশীল সমাজ সম্পর্কিত গ্রামসীয় বিশ্লেষণী কাঠামোর বিপরীতে ইদানিংকালে পাটনামের বিশ্লেষণী ধারা বহুল প্রচলন পেয়েছে। তার ধারণা অনুযায়ী সরকারের দক্ষতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন – এ দু'টিই 'নাগরিক সম্প্রদায়'-এর তৎপরতার ফলশ্রুতিতে অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। পাটনাম একে বলেছেন 'সামাজিক পুঁজি' (social capital) যা 'নাগরিক শক্তি'-র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং এ দুটো যখন পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা অনুবিদ্ধ (embedded) হয়, নাগরিক শক্তি তখনই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। লক্ষণীয়, বাংলাদেশের সুশীল সমাজের বিশ্লেষণে গ্রামসীয় কাঠামো মৌলিকভাবে প্রাসঙ্গিক হলেও, নব্য টকভেলীয় (পাটনাম প্রবর্তিত) ধারণাগুলোও বাস্তবতা অনুধাবনে বেশ সহায়ক।

রাষ্ট্রজীবনে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার এই দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উপনিবেশবাদ বিরোধী বহু মুক্তি সংগ্রামকে প্রভাবিত করে। গ্রামসী সুশীল সমাজের মধ্যে খেটে খাওয়া মানুষের সাথে সংলগ্ন-বুদ্ধিজীবীর (organic intellectual) উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখেছেন। এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বহু নেতা organic intellectual হিসেবে ভূমিকা পালন করতে চেয়েছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ ছয় দফা প্রণয়নের সাথে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের, যেমন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক রেহমান সোবহান প্রমুখকে organic intellectual বলতে চাইবেন। বাংলাদেশের বামপন্থী অনেক নেতাই ছিলেন এ দলের

অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে মনে পড়ে শ্রমিক হিসেবে আদমজী পাটকলে কর্মরত অবস্থায় নিহত উচ্চশিক্ষিত কম্যুনিস্ট সংগঠক শহীদ তাজুলের কথা।

সুশীল সমাজকে নিয়ে চিন্তার বিবর্তনের এই পথ অনেক দীর্ঘ। আমাদের প্রকাশমান জাতীয় প্রেক্ষিতকে সঠিকভাবে অনুধাবনে সহায়ক হবে মনে করে আমি খুব সংক্ষেপে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা

১৯৮৬ সালে ফিলিপিন্সে মার্কোস বিরোধী 'হলুদ বিপ্লব' নাগরিক আন্দোলনের নতুন পর্যায়ের সংকেত দেয়। নব্বইয়ের দশকে অবশ্য পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনাবলীর কারণে সুশীল সমাজের সংজ্ঞা, প্রকাশ ও ভূমিকা নতুন রূপ নেয়, নতুন বিতর্কেরও জন্ম দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙ্গে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৯১ থেকে নব্য গণতন্ত্রের যে প্রসার আমরা দেখতে পাই সেখানে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের নবোদ্ভিন্ন সুশীল সমাজের ভূমিকা নজর কাড়ে বিশেষভাবে। চেকোশ্লভাকিয়াতে 'ভেলভেট বিপ্লবের' ফলে সুশীল সমাজের পুরোধা ব্যক্তিত্ব নোবেল বিজয়ী ভাকলাভ হাভেল রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ পান। একইভাবে জর্জিয়ার 'গোলাপ বিপ্লবে' এবং ইউক্রেনের 'কমলা বিপ্লবে' নাগরিক নেতৃবৃন্দ ছিলেন প্রথম সারিতে। অনেকেই সাম্প্রতিককালের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার 'আরব বসন্ত'-কে এরই ধারাবাহিকতায় দেখতে চাইবেন। ২০০৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামোগত বিপর্যয়ের মুখে "ওয়াল স্ট্রীট দখল করো" (Occupy Wall Street) ও "আমরাই শতকরা ৯৯ জন" (We are the 99 per cent) এসব শ্লোগান নিয়ে যে জনবিস্ফোরণ লক্ষ করি তারও নেতৃত্ব দেয় সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন। হয়তো বাংলাদেশের গণজাগরণ মঞ্চের অভিজ্ঞতাকেও এই আলোকে দেখার সুযোগ আছে।

বলাবাহুল্য এই সব আঞ্চলিক ও জাতীয় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সুশীল সমাজের ভূমিকা, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বৈচিত্রময়। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুশীল সমাজ গোষ্ঠী-চিন্তা দ্বারা তাড়িত হয়ে রাষ্ট্রের একক প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। তাই দ্বন্দ্বের মূল জায়গাটা ছিল রাষ্ট্রের সাথে বাজারের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক। এই দ্বন্দ্বের চরিত্রটি গ্রামসীর "দুই সমাজের" তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে (স্বল্পোন্নত দেশে) সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সামাজিক পুঁজির বাজারের উদ্যোগও বাস্তব পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় সহায়তা করে। লক্ষণীয়, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্প্রদায় গ্রামসীর চিন্তার বিপরীতে নব্য-টকভেলীয় ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে 'সুশীল সমাজ' একদিকে যেমন একটি প্রত্যয়, অপরদিকে একটি প্রক্রিয়া। প্রত্যয়টি সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি প্রক্রিয়াটির গতিপথে বেগ এনেছে; অপরদিকে প্রক্রিয়ার অগ্রাভিমুখী যাত্রা প্রত্যয়টিকে আরো বাস্তবমুখী করেছে। সুশীল সমাজ তথা নাগরিক আন্দোলনের বহুমাত্রিকতা সহজবোধ্য হয় যখন আমরা তার কর্মভিত্তিক প্রকাশকে বিবেচনায় নেই। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমিক সংঘসহ পেশাজীবীদের সংগঠন, নির্দিষ্ট কোনো বিষয় বা গোষ্ঠীর লক্ষ্যে সমর্থনমূলক উদ্যোগ, বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত সম্প্রদায়গত উদ্যোগ, প্রচার মাধ্যম, জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংস্থা ইত্যাদি। রয়েছে নারী অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার আন্দোলন।

বাংলাদেশে সুশীল সমাজে কতগুলো প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত তার কোনো হিসাব আমাদের জানা নেই। অনেক গবেষক এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিয়ে বাংলাদেশের সুশীল সমাজের আয়তন নিরূপণ করেছেন যা নিতান্তই একটি সংকীর্ণ প্রচেষ্টা। অনেকে আবার আরো সংকীর্ণ সংজ্ঞার ভিত্তিতে এনজিও ব্যুরো-তে নিবন্ধিত বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকেই শুধু সুশীল সমাজ ভেবেছেন। বলাবাহুল্য সুশীল সমাজের একটি বড় অংশ (এর সংজ্ঞা অনুযায়ী) অপ্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে বিকেন্দ্রায়িতভাবে ক্রিয়াশীল। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ শুমারি ব্যতীত এই প্রত্যয়টির প্রকৃত আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, হয়তো প্রয়োজনও নেই। এ বিষয়ে পরে আসছি।

তবে বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও প্রভাবশালী অংশটি দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনের জন্য সচেষ্ট, রাষ্ট্রীয় নীতি পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক করেন, মানবাধিকার রক্ষায় সোচ্চার থাকেন। এরা মূলত উদার গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিকামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। এ সম্বন্ধেও আরেকটু পরে আলোচনায় আসছি।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের গৌরবোজ্জল উত্তরাধিকারের কথা আমার বক্তব্যে প্রথমেই উল্লেখ করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সমাজের অনেকে অস্ত্র হাতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দিয়েছেন, প্রবাসী সরকারে দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থাৎ এটা ছিল বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক ক্রান্তিকাল, যেখানে রাজনৈতিক সমাজ আর সুশীল সমাজ অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘরে ফেরা সুশীল সমাজের এই অনন্য ব্যক্তিরা শরণার্থী পুনর্বাসন ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে যুক্ত হন। এই প্রবণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ব্র্যাক – যা আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। অপর উদাহরণ হলো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র – যেটি বিশ্বে গণমুখী চিকিৎসা সেবার একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এরপর আমরা লক্ষ করি ওই সব সংগঠন ও ব্যক্তি জরুরি পুনর্বাসন ও পুনগঠন কার্যক্রম থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন তথা একটি কল্যণকর রাষ্ট্র গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়। ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন সামাজিক শক্তি তখন 'দেশ গড়ার' আন্দোলন সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও শ্রমিক শ্রেণীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ ব্যাংক সহ অনেক প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই পরিবর্তনের চেষ্টায় অগ্রণী হয়। এই প্রবণতারই ধারাবাহিকতায় কিছু প্রতিষ্ঠান আইনী সহায়তা প্রদান তথা মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনে ব্রতী হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জাতীয় রাজনীতিতে যে পরিবর্তন আসে তার ফলে সুশীল সমাজকে জনমানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি মোচনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে বিভিন্নভাবে যুক্ত হতে হয়। আপনাদের অনেকের হয়তো মনে আছে স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিকে একতাবদ্ধ করতে ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে ৩১ জন বুদ্ধিজীবী যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন তৎকালে তা কী সূদুর প্রসারী ভূমিকা রেখেছিল। পরবর্তীতে সাংবিধানিক পথে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে তিন জোটের যে যুক্ত ঘোষণা আসে তার রূপরেখাটিও কিন্তু একটি সুশীল সমাজের গোষ্ঠীর কাছ থেকেই আসে, যেখানে প্রয়াত ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদের ভূমিকা ছিলো অন্যতম। আর আশির দশক জুড়ে 'ঢাকা অবরোধ' সহ রাজপথের আন্দোলনে সংস্কৃতিসেবীরা, পেশাজীবীরা ও ছাত্র-যুবকর্মীরা তো ছিলেনই। তাই ১৯৯১-এর পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যে নবযাত্রা সূচিত হয় তাকে মূর্তরূপ দেয়ার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয়, বিশেষ করে ছাত্র-শিক্ষক-সাংস্কৃতিক কর্মী-পেশাজীবীদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আর সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের অসমাপ্ত দায় – পাকিস্তানি বাহিনীর যুদ্ধাপরাধী দোসরদের বিচারের দাবিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের কথা। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল ১৯৯২ সালের মার্চে 'গণআদালতে' যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি ঘোষণা। স্মতর্ব্য, গণআদালতের প্রতিটি সদস্যই ছিলেন সুশীল সমাজের অংশ। তাই

১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আজ যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ আমরা দেখি তাকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের অনেক ত্যাগ ও অবদান রয়েছে।

আর এর মাঝে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের দুর্দশা মোচনে বিভিন্ন উদ্যোগ তো ছিলই। ছিল একটি তথ্য অধিকার আইন পাশের এবং দুর্নীতি দমন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন গঠনের সফল আন্দোলন। আরও ছিল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী উদ্যোগ। ছিল তেল-গ্যাস-বন্দর রক্ষা কমিটির কার্যক্রম।

সাম্প্রতিক প্রবণতা

তত্ত্ব যতই পরিপক্ক হোক না কেন এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যাই বলুক না কেন, বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সংজ্ঞা নিয়ে জাতীয়ভাবে স্বচ্ছ ঐকমত্য এখনও লক্ষ করা যায় না। আগেই বলেছি সুশীল সমাজের পরিধি শুধুমাত্র সরকারিভাবে নিবন্ধিত অথবা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট সংগঠনগুলোতে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে সুশীল সমাজ ও সুশীল সমাজের সংগঠন (civil society organisation – CSO)'এই দুটির মাঝে পার্থক্য করতে হবে। কারণ সুশীল সমাজ সর্বদা কাঠামোগতভবে সংগঠিত নাও হতে পারে। অনেক দেশেই বা অনেক পরিস্থিতিতে অনানুষ্ঠানিক স্বতঃস্ফূর্ত নাগরিক উদ্যোগ আন্দোলন পরিচালনা করে থাকে যার প্রথাগত অর্থে কাঠামো, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি ও কর্মপন্থা থাকে না, থাকে না স্বীকৃত নেতৃত্ব। সেই অর্থে সুশীল সমাজের অভিপ্রকাশে লক্ষ করা যায় তারল্য (fluidity) এবং নমনীয়তা (flexibility)।

এই অনানুষ্ঠানিকতার চরম প্রকাশ হচ্ছে ব্যক্তি নাগরিক যখন একাই নৈতিক অবস্থান থেকে কোনো অন্যায় বা বৈষম্যের প্রতিবাদ করে। একাই পোস্টার হাতে (কখনও বা পরিবার-বান্ধবদের নিয়ে) দাঁড়িয়ে যায় প্রেস ক্লাবের সামনে অথবা শহীদ মিনারে। ২০১৪ সালের ৫ই মে গুম-হত্যার বিরুদ্ধে সংসদ ভবনের সামনে নাগরিকরা যে মানববন্ধন করেন সেটা ছিল এরকমই এক অনানুষ্ঠনিক উদ্যোগ। তবে নাগরিক হলেই সে সক্রিয়ভাবে সুশীল সমাজের অংশ হয় না। নাগরিক তখনই সমাজ হয় যখন সে নির্দিষ্ট বিষয়ে তার অবস্থান ও মতামতকে প্রকাশ্যভাবে উপস্থাপন করে। যখন সে সামান্য হলেও তার অবস্থানের জন্য ঝুঁকি নেয়। তথ্য-প্রযুক্তি প্রসারের যুগে, অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট, ব্লগারদের আমরা সুশীল সমাজে নবতম অন্তর্ভুক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

সুশীল সমাজের এই ব্যাপকতর সংজ্ঞা তাকে চিহ্নিতকরণ ও দায় নির্দিষ্টকরণে বিপত্তি সৃষ্টি করে বলে অনেকে মনে করেন। সেক্ষেত্রে যেটা উল্লেখ্য সেটা হলো গোটা কয়েক ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য আছে যা দিয়ে সুশীল সমাজ ও তার অন্তর্ভুক্ত সংগঠনকে দ্রুত চেনা সম্ভব। *প্রথমত*, সে রাষ্ট্রের অংশ হতে পারবে না অর্থাৎ সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হতে পারবে না, এমনকি অর্থায়নসহ স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবে না সরকারের সাথে। অবশ্য বেশ কিছু বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশীদার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় সুশীল সমাজের এই বৈশিষ্ট্যটি অনেক সময় প্রশ্নের মুখোমুখি হয়।

দ্বিতীয়ত, সুশীল সমাজ কোনো দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকবে না। এটার অর্থ এই নয় যে সুশীল সমাজের কোনো রাজনৈতিক চিন্তা বা মূল্যবোধ থাকবে না। বলাবাহুল্য, আদর্শিক নীতিবোধ থেকে তাড়িত হলেই তো ব্যক্তি নাগরিক সুশীল সমাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। বিষয়টি হচ্ছে সুশীল সমাজের কোনো সক্রিয় ব্যক্তির রাজনৈতিক দলীয় সদস্য পদ থাকাটা সমস্যাজনক। এটা আরো সমস্যা সৃষ্টি করে যখন সেই ব্যক্তি শাসক দলের কোনো দায়িত্বে থাকেন। এর ফলে সংগঠন বা আন্দোলনের স্বাধীন চিন্তা বা পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রটি সংকুচিত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, সুশীল সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ হতে হবে। একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে সুশীল সমাজ প্রকাশ্যভাবে, রাষ্ট্রের ঘোষিত নীতিমালার আওতায় তার ইচ্ছাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এটাই কাম্য। সেই জন্য সে প্রচার ও সমাবেশের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করবে, জন সম্পৃক্ততা বাড়াবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে সরকার সুশীল সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক নীতিমালা যদি অযৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক করে, তবে তা তার কর্মকাণ্ডের অন্তরায় হতে পারে। আর সংগঠনটি যদি রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদানগুলোতে বিশ্বাস না করে তবে তো সে সমস্যা আরো গভীর।

তবে সাধারণভাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সুশীল সমাজের তিনটি মৌলিক ও ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য হলো: রাষ্ট্র-বহির্ভূত সংগঠন, রাজনৈতিক দলের বাইরে অবস্থান ও ঘোষিত কর্মসূচির পক্ষে প্রকাশ্য ও স্বচ্ছ কর্মকাণ্ড পরিচালনা।

আমার বক্তৃতার শেষাংশে বাংলাদেশে সুশীল সমাজ নিয়ে কিছু চলমান বিতর্ক সম্পর্কে কয়েকটি ভাবনা-দুর্ভাবনা তুলে ধরতে চাই।

বিতর্কসমূহ

কর্মপরিধি। সুশীল সমাজের কর্মপরিধি নিয়েও অনেক সময় বিভ্রান্তি লক্ষ করা যায়। অনেকেই অভিযোগ করেন এরা প্রায় "সব বিষয়ে" কথা বলে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সুশীল সমাজের প্রতিটি এককই কোনো না কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে উৎসাহী হয়েই সংগঠিত হয়েছে। এই বিষয় সূচি বেশ দীর্ঘ। মূলত তা হচ্ছে সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রায়ন, দুর্নীতি মুক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য হ্রাস, সমাজের অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ কমানো ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সুশীল সমাজ সংগঠনের মধ্যে তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। *প্রথম* ধারায় আছে সেসব প্রতিষ্ঠান যারা তৃর্ণমূল পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমুখী উদ্যোগ পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তারা সদস্য সংগ্রহ করে থাকে। তাদের অনেকেরই আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন থাকে। এদের প্রচলিত ভাষায় implementing CSO/NGO বা (উন্নয়ন) কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা বলে। বাংলাদেশের কয়েক হাজার বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বা NGO এরা।

দ্বিতীয় ধারার সংগঠনগুলো হচ্ছে যারা মূলত গবেষণা ও নীতি পর্যালোচনা করে। এরা যে শুধু think tank তা নয়। বিজ্ঞান চক্র, সাক্ষরতা আন্দোলন ইত্যাদি এর অংশ। এদের প্রায়শই knowledge-based CSOs বলে। সিপিডি এই কাতারে অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় ধারায় রয়েছে যাদের আমরা advocacy CSO বলি। দুর্নীতি, বৈষম্য, বঞ্চনা, অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এরা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সোচ্চার থাকে এবং প্রতিরোধ সৃষ্টিতে সক্রিয় থাকে। এই ধারার অগ্রণী উদাহরণ হলো আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)। যেহেতু এই ধারাটি তাদের কাজের চরিত্রের কারণে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান, অনেকেই সুশীল সমাজ বলতে এদেরকেই বোঝেন। যেহেতু এই ধারার সংগঠনগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল মূল প্রতিষ্ঠানের উপর সামাজিক নজরদারির দায়িত্ব পালন করে, তাই বাহ্যত মনে হতে পারে তারা রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে তারা অযাচিতভাবে মতামত দিচ্ছে।

উপরন্তু, মানবাধিকার, আইনের শাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, রাষ্ট্রের সম্পদের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় কার্যত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তাই কান টানলে মাথা আসার মতো এদের বিভিন্ন সম্পর্কিত বিষয়ে মন্তব্য করতে হয়। তবে সে মন্তব্য অবশ্যই তথ্য-নির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে।

উল্লেখ্য, বাস্তবে অনেক সংগঠনই একই সাথে একাধিক (বা তিনটি) ধারাতেই কাজ করে তাই তাদের উলম্ব (vertical) সংযুক্তি দেখা যায়। আবার অনেকেই অভিন্ন বিষয়ে জোট গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনা করে আনুভূমিক (horizontal) সংযুক্তি ঘটায়। সুশীল সমাজের সংগঠিত অংশের এই কাঠামোগত সংহতি নিঃসন্দেহে তাদের কণ্ঠস্বরকে আরো উচ্চকিত করে। আর যাদের স্বার্থে তা আঘাত করে, তারা বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়। উপরোল্লিখিত তিনটি শ্রেণীবিভাগে, বাংলাদেশে সুশীল সমাজের মূলধারাটি এখনও উদার গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিকামী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত।

রাজনীতি। সুশীল সমাজ সামগ্রিকভাবে না হলেও, তার কিছু কিছু নেতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সামাজিকভাবে সচেতন ও সক্রিয় ব্যক্তির জন্য দেশের আর দশজন নাগরিকের মতো রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের ইচ্ছা থাকাটা অযৌক্তিক নয়। অনেক সময় আবার এই উপলব্ধি আসতে পারে রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে না পারলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট স্থায়ীভাবে নিরাময় করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য ১৯৭২-এর জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশকে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংশোধনের মাধ্যমে বিদেশি সাহায্য লাভকারী কোনো উন্নয়নধর্মী প্রতিষ্ঠানের প্রধানের জাতীয় নির্বাচন করার অধিকার চাকরি ছাড়ার তিন বছর পর্যন্ত রহিত করা হয়েছে। এই বিধান সরকারি কর্মচারীদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য।

রাজনীতিতে নিজস্ব অবস্থান শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংগঠনকে ব্যবহার করা অবশ্যই অনুচিত। প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তাদের 'সমাজ' বদল করা উচিত। তবে সুশীল সমাজে রাজনীতি প্রবেশের অপর মাধ্যম হচ্ছে যখন রাজনৈতিক দলগুলো পেশাজীবীদের সমিতিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয় ছত্রছায়ায় নিয়ে আসে, কোনো সময় তা করে সংগঠনগুলোকে বিভক্ত করে। এর ফলে এসব সংগঠন পরবর্তীতে তাদের সদস্যদের ও অংশীজনদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়। এতে তারা নামে সুশীল সমাজ থাকলেও, কার্যত রাজনৈতিক সমাজের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়। বাংলাদেশের একটি অন্যতম বড় বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা যখন পদে থেকেই সক্রিয় দলীয় রাজনীতি শুরু করেন তখন তার সংগঠনে বিপর্যয় নেমে আসে।

তবে সাম্প্রতিককালে ভারতের আম আদমী পার্টির আবির্ভাব অনুধাবনীয়। তথ্য অধিকার আইন ও জন লোকপাল আইনের জন্য আন্দোলন করতে করতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তার সহকর্মীরা নাগরিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করেন। একই সাথে জনমানুষের মাঝে প্রচলিত রাজনীতির বাইরে কোনো একটি বিকল্প ধারার আকাঙ্ক্ষাকে অনুভব করেন। সৃষ্টি হয়

আম আদমী পার্টি, যেখানে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যোগদান করেন এবং দলটি দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। তারা দিল্লী অঞ্চলের সরকারও গঠন করেন। যদিও তারা প্রচলিত কাঠামোর মাঝে নতুন ধারার রাজনীতি পরিচালনার সমস্যাগুলো দ্রুতই টের পান। যাই হোক এএপি-র অভিজ্ঞতাটি হলো সুশীল সমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজে পরিণত হওয়ার একটি ধ্রুপদী উদাহরণ। বাংলাদেশে কেউই এ ধরনের চ্যালেঞ্জ সফলভাবে নিতে পারবে কিনা তা সময়ই বলে দিবে।

বিরাজনীতিকরণ। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ দেশে বিরাজনীতিকরণের অপচেষ্টায় লিপ্ত বলে কেউ কেউ অপবাদ দেন। অনেক সময় তথাকথিত এক-এগারোর সরকারের প্রতি কথিত সমর্থনকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আমাদের মনে থাকার কথা, ২০০৬ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিবাদমান দুই রাজনৈতিক পক্ষ, নিজস্ব অভিন্ন গোষ্ঠী স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে, শান্তিপূর্ণভাবে সাংবিধানিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্যর্থ হয়। সংবিধান নির্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির অপব্যবহারের মাধ্যমে জনসমর্থন ব্যতীত রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা হয়। সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক শূন্যতা, জাতীয় জীবনে অনিশ্চয়তা। নিঃসন্দেহে এই পরিস্থিতি ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয়দের (political elite) অপরিপক্কতার ফল। স্মরণ রাখতে হবে যে চারজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সদস্য – ড. আকবর আলী খান, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শফি সামী ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান হাসান মাসুদ চৌধুরী – সংবিধানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন সুশীল সমাজের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। যে শক্তি পরবর্তীতে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে তা সংবিধানের প্রলম্বিত ব্যাখ্যা দিয়ে, উচ্চ আদালতের অনুমোদনে দুই বছরের শাসনান্তে একটি সর্বজন স্বীকৃত নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এর মধ্যবর্তী সময়ে সে সরকার (যার ভেতর একাধিক সরকার ছিল বলে মনে করা হয়) বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ঘোষণা করলেও তার ভ্রান্ত ও কলুষিত প্রয়োগ তাকে জনমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

বাংলাদেশের সাংঘর্ষিক রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ সুশীল সমাজ তথা জনগণের একটা বড় অংশ হয়তো মনে করেছিল যে, এক-এগারোর সরকার যে সব দুর্নীতিবিরোধী ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে তা আপাত দৃষ্টিতে সুশীল সমাজের বহু দাবীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গকে শক্তিশালী করে উন্নততর ভিত্তিতে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন যাত্রা শুরু হবে।

সময়ের সাথে সাথে এটা স্পষ্ট হয় যে, এটি ছিল একটি ভ্রান্ত প্রত্যাশা। কারণ চলমান রাষ্ট্রযন্ত্র সর্বদাই নতুন নতুন স্বার্থ গোষ্ঠীর জন্ম দেয় যারা এই সব সংস্কারের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে

প্রতিশ্রুত কার্যক্রমকে বিপথগামী করে। অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদগণ যে দোষে দুষ্ট বলে মনে করা হয়, তারাও সে রোগে দ্রুত আক্রান্ত হয়। উপরন্তু, সংস্কার যদিও বা কিছু হয় তা যে পরবর্তী সরকারের আমলে টেকসই হবে তারও নিশ্চয়তা থাকে না। তাই অনির্বাচিত সরকার দ্বারা সুসাশন অর্জনের ক্ষেত্রে টেকসই পরিবর্তন আনা যায় না – এই অভিজ্ঞতাটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সুশীল সমাজের পথ চলায় আগামীতে উপকারী হবে। তবে যথা সময়ে নির্বাচনের দাবীতে সুশীল নেতৃবর্গ ছিল একনিষ্ঠ, তাই গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়া যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেই লক্ষ্যে ক্ষমতায় থেকে দল গঠনের মতো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তারা সর্বদাই ছিল উচ্চকণ্ঠ।

তবে ম্যারাথনকে স্প্রিন্টে পরিণত করার এ ধরনের চেষ্টা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে লক্ষ করা যায়। এমনকি আমাদের অঞ্চলে পাকিস্তানে জেনারেল মোশাররফ ক্ষমতা নিয়ে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিলে, পাকিস্তানের দুইটি বড় দলের অপশাসনে বিক্ষুব্ধ সুশীল সমাজের একটি বড় অংশ তাকে সমর্থন দেয়। এর পরের ঘটনাবলী আমাদের সবার জানা আছে।

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ার মূল কারণ হলো দুর্বল রাষ্ট্রীয় অঙ্গসমূহ, অনুন্নত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এবং অনুপযুক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই পরিস্থিতিতে অরাজনৈতিক শক্তি বা ভিন্ন দেশীয় শক্তির জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়। তাই ঐতিহাসিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব বিরাজনীতিকরণ প্রক্রিয়ার প্রকৃত উৎস সুশীল সমাজে নয়, রাজনৈতিক সমাজে নিহিত। উপরন্তু রাষ্ট্রের ঘোষিত নীতিমালাকে লঙ্ঘন করে যখন শাসক শ্রেণী, যখন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা ব্যক্তি স্বার্থকেই অন্যায় আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া হয়, তখনি সমাজে বিরাজনীতিকরণের ধারা বেগবান হয়।

বৈধতা ও প্রতিনিধিত্বশীলতা। বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে সুশীল সমাজের বৈধতা (legitimacy) ও তার প্রতিনিধিত্বশীলতাকে (representativeness) প্রায়শই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। মনে রাখতে হবে প্রতিটি সক্রিয় সংগঠনই সরকারের কাছে তার কর্মপরিকল্পনা ও অর্থায়নের উৎস সম্বন্ধে তথ্য দিয়ে, অনুমতি নিয়ে তাদের তৎপরতা পরিচালনা করে। তাই বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে এসব সংগঠন যা করছে সব তার প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসন দ্বারা নির্দিষ্ট এবং সরকারি বিধিমালা দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই মাঝে মধ্যে কোনো বিরূপ সরকারি কর্তাব্যক্তি যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন তা নিতান্তই অজ্ঞানতাপ্রসূত।

তবে সুশীল সমাজের মূল বৈধতা কোনো সরকারি আমলা দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। সেটা হয় তার লক্ষ্যনির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা অংশীজনদের সামাজিক অনুমোদনের মাধ্যমে। তাই সুশীল সমাজের বৈধতার প্রয়োজনীয় শর্ত (necessary condition) যদি হয় সরকারি অনুমোদন, তার বৈধতার যথেষ্ট কারণটি (sufficient condition) জনমানুষের নীরব সম্মতিতে প্রোথিত। তাই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে কোনো সুশীল সংগঠনের বিবাদে যুক্ত হওয়ার সুযোগ কম থাকে।

শাসক গোষ্ঠীর সাথে মতপার্থক্য হলেই সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বলা হয় "যোগ্যতা থাকলে নির্বাচন করে আসুন"। মনে হয় দেশ নিয়ে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে সবাইকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। তবে প্রাগ্রসর সমাজে বৈধতার উৎস সম্বন্ধে সীমিত ধারণা থেকে এই বিভ্রান্তির উদ্ভব। বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয় জীবনে বৈধতার একমাত্র রূপ নির্বাচনী বৈধতা (electoral legitimacy) নয়। যদিও এখানে জনপ্রতিনিধিদের অধিকারকে খাটো করে দেখা হচ্ছে না। বিকাশমান সমাজে বৈধতার অনেক সুশীল সংগঠনের সামাজিক প্রতিনিধিত্বশীলতার উৎস হচ্ছে তাদের সদস্যবৃন্দ ও অংশীজনরা। তবে সমাজে সব প্রতিনিধিত্বশীলতাই আংশিক। এইরূপ আংশিক প্রতিনিধিত্বশীলতা নিয়ে বিরাজ করেন স্কুলের শিক্ষক, স্থানীয় চিকিৎসক, গ্রামীণ সমাজপতিরা, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী উদ্যোক্তারা, ধর্মগুরুরা। মিডিয়ার ক্ষেত্রে একজন সম্পাদক যখন তার লেখনী ধরেন তখন তার বৈধতা আসে প্রতিটি পাঠকের কাছ থেকে যারা পয়সা দিয়ে প্রতিদিন সকালে তার পত্রিকা কেনেন। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন টিভি দর্শক অন্য চ্যানেলে চলে না যাচ্ছেন ততক্ষণ সে একটি টক শোকে বৈধতা দিচ্ছেন – এমনকি অংশগ্রহণকারীর বক্তব্যের সাথে একমত না হলেও।

তবে শেষ বিচারে সুশীল সমাজের বৈধতা ও প্রতিনিধিত্বশীলতা নিরূপিত হয় তার নৈতিক শক্তির দ্বারা। তাই লক্ষ করা যায় অনেক সময় চরিত্র হনন করে জনমানসে সুশীল সমাজের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নৈতিক অবস্থান দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়।

তিনটি দুর্বলতা। তাহলে সুশীল সমাজ এবং এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোর মূল দুর্বলতাগুলো কোথায়? যেহেতু এই সমাজটি বৈচিত্র্যময় সেহেতু এসব সংগঠনের সমস্যাগুলোও বিভিন্ন। তবু আমার বক্তব্যের শেষে তিনটি নির্বাচিত অভিন্ন সমস্যা উল্লেখ করছি।

ক. সুশীল সমাজের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের প্রেক্ষিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অবস্থানকে সংহত করা। যেহেতু চলমান রাজনীতি আমাদের সমাজকে গভীরভাবে দ্বিখণ্ডিত করেছে, সেহেতু বিশ্বাসযোগ্যভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা

কঠিনতর হয়ে উঠছে। পেশাদারীত্বের সাথে কর্মসম্পাদন দুরূহ হয়ে উঠছে। উল্লেখ্য, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দরাও অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চ বর্গের মানুষ হয়ে থাকেন। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে গিয়ে তারা কোন ঝুঁকি নিতে উৎসাহী হন না। কেউ কেউ হয়তো এটা তাদের যথোপযুক্ত নাগরিক সাহসিকতা (civic courage)-এর অভাব বলে অভিহিত করবেন।

খ. সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর একটি বড় অংশে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে ও অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি ভঙ্গের ঘটনা ঘটে, দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। এক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিতভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যদিও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে একটি ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তারপরও অনেক গ্রামীণ এনজিও প্রকৃতপক্ষে শোষণমূলক সুদের ব্যবসায় নিয়োজিত। তবে এদের সাথে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেট এনজিও-দের এক করে দেখা ঠিক হবে না।

গ. সুশীল সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। নেতৃত্বের হস্তান্তর ঘটে না। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়, প্রতিষ্ঠানের টেকসই হবার সম্ভাবনা দুর্বল হয়ে পড়ে। নেতৃত্বের উত্তরাধিকার সৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি কাঠামো শক্তিশালী করে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা দরকার।

সমাপনী মন্তব্য

বাংলাদেশের সুশীল সমাজ তার দীর্ঘ পথ চলায়, সিঁড়ি ভাঙ্গায় আজ এক বিশেষ মুহূর্তে উপনীত হয়েছে। রাজনৈতিক সমাজ ও সুশীল সমাজের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থার সম্পর্কটি এই মুহূর্তে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ভঙ্গুর। সম্প্রতি ঘোষিত সম্প্রচার নীতিমালা এই আস্থার ভিতকে আরও একটু দুর্বল করে দিয়েছে।

স্বাধীনতা পূর্বকালের স্বাধিকার আন্দোলনে, প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে, স্বাধীনতা-উত্তর দেশ গড়ার উদ্যোগে এবং দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ প্রায়শই রাজনৈতিক সমাজের সাথে পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। লক্ষণীয় গত দুই দশকে গণতন্ত্রের নবযাত্রায়, এই সম্পর্ক পরিপূরকতা থেকে ক্রমান্বয়ে প্রতিযোগিতামূলক এবং অনেক সময় বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে থাকলে রাজনৈতিক সমাজ সর্বদাই অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সোচ্চার সুশীল সমাজকে পাশে পেতে চায়। আর রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করলে সেই রাজনৈতিক গোষ্ঠীই জবাবদিহিতার দাবীর মুখে সুশীল সমাজকে প্রতিপক্ষ মনে করছে।

কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সুশীল সমাজের সাথে এই বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক আরো প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে।

গ্রামসীয় বা নব্য টকভেলীয় – যে ব্যাখ্যা কাঠামোই প্রয়োগ করি না কেন, তাতে দেখা যায় জাতীয় অগ্রগতির ধারাকে ধাবমান রাখার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি সহায়ক নয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন ব্যবস্থা টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত – এটি একটি স্বীকৃত সত্য। এর বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী মনোভাব যখন সুশীল সমাজকে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে অপারগ করে তখন রাজনৈতিক সমাজ তার আলোকিত আত্ম-স্বার্থ রক্ষায় পর্যুদস্ত হয়। তখন সমাজে, অর্থনীতিতে এবং বৈদেশিক সম্পর্কে যে দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা দেখা দেয় তা শান্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসূভাবে নিরসনের কোনো জায়গা (space) থাকে না। সৃষ্টি হয় বলক্ষয়ী প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। বিপর্যস্ত হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

তাই গণতন্ত্র ও উন্নয়নের যৌথ লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমাজ ও সুশীল সমাজের মধ্যে, উদার ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্রীয় মনোভঙ্গির বাতাবরণে, একটি আস্থা প্রবর্দ্ধক নীতি-সংলাপ দেশে আজ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। শহীদ স্মৃতির প্রতি আবারো শ্রদ্ধা জানিয়ে, আশা করবো সংশ্লিষ্ট পক্ষরা চিন্তার আদান-প্রদানের এই ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করতে আন্তরিকতা ও পরিপক্কতা প্রদর্শন করবেন।

আপনাদের মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।